গবেষণা পদ্ধতি: ভূমিকা
(Research Methodology: An Introduction)

সেখ গোলাম মাসুম

গবেষণা কি / গবেষণারঅর্থ :

ইংরাজীতে গবেষণার প্রতিশব্দ হল Research, অর্থাৎ Re অর্থপূনঃ Search, অর্থঅনুসন্ধান । যার বাংলায় মূল অর্থ পুনরায় অনুসন্ধান করা বা পুনরনুসন্ধান । গবেষণা বিষয়ে'Research' শব্দটি বাংলায় অধিক প্রচলিত একটি বাচন । এর সমর্থক শব্দ হল জিজ্ঞাসা প্রদত্ত অনুসন্ধান, বিকিরন এবং নিরুপন । পুনরনুসন্ধান অথবা গবেষণা যাই-ই ব্যবহার করা হোক না কেন যার মূল উদ্দেশ্য সত্যের অনুসন্ধান । অর্থাৎ গবেষণাহল সত্য অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া,যার সাধারন অর্থ হল 'সত্য' (Truth) ও 'জ্ঞান'(Knowledge)-এর অনুসন্ধান । অন্যভাবে বলা যায়, গবেষণা হল তুলনামুলক উন্নত পর্যবেক্ষন করা, ভিন্ন প্রেক্ষিতে খোঁজা এবং বাড়তি জ্ঞানের সংযোজন করার সুশৃংখল ব্যবস্থা । কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের জন্য যথা সম্ভব অভিজ্ঞতাবাদী অথবা বৈজ্ঞানিক ও সুসংবদ্ধ অনুসন্ধান হল গবষণা । সার্বিক ভাবেবলা যায়গবষণা হল কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের ব্যপক উন্মুক্তকরন এবংকঠোরসুসংবদ্ধ অনুসন্ধান।

গবেষণাযতটা সম্ভব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তথ্য অনুসন্ধানের এক প্রক্রিয়া । ইংরাজীতে RESEARCH শব্দটি একই সঙ্গে কতগুলি শব্দ সমষ্টি বহন করে । যেমন :

R - Rationalthiking.
E - Expert and exhaustive Thinking.
S- Search for solution.
E- Exactness.
A- Analytical analysis.
R- Relationship of facts.
C-Careful rearding, Critical observation,Constructive attitude.
H- Honesty and Hard Wark.

Researchশব্দটিরএরূপপূর্ণাঙ্গধারণা পাওয়ার পর গবেষণার একটি সম্যক ধারনা সম্পর্কে অবহিত হতে পারি ।

The Advanc Learner Drctionaryof Current Englishএ গবেষণার যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা হল, "জ্ঞানের যে কোনো শাখায় নতুন তথ্য সংগ্রহের জন্যে ব্যাপক ও সযত্ন তথ্যানুসন্ধানই হল গবেষণা"(A carefull investigation or inquiry specially through research for now facts in any branch of knowledge) (The Advance learner's Drtioray off correct English, Oxford, 1952, P-1069) । রেডম্যান ও মরী (Redman and Mory) –রমতে, ‘‘নতুন জ্ঞান আহরনের সুসংবদ্ধ চেষ্টা প্রচেষ্টা হল গবেষণা" (Systematized effort to gain new knowledge") । রাস্কের মতে, গবেষনা একটি বিশেষ অভিমত যা মানস কাঠামোর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গি, গবেষণা যেসব প্রশ্নের অবতারনা করা যা এর উদঘাটন আগে কোনো দিন হয় নাই, এবং গবেষণার মাধ্যমে সেই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় । গ্রীনের কথায়, জ্ঞানানুসন্ধানের আদর্শিত বা মান সম্মত পদ্ধতির প্রয়োগই গবেষণা । ফালদালীন- এর মতে, উপস্থিত জ্ঞানের প্রকৃতির লক্ষ্যে সুশৃংখল অনুসন্ধান বা পর্যালোচনা, যা উদ্ধৃতিপ্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তা হল গবেষণা । জন. ডব্লিউ বেষ্টের মতে, গবেষণা হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ দ্বারা বিশ্লেষনের আরও আনুষ্ঠানিক, সুসংবদ্ধ ও ব্যাপক প্রক্রিয়া । রিচার্ড এর মতে গবেষণা হল সাধারন ভাবে প্রয়োগযোগ্য নতুন জ্ঞান, যা সৃষ্টি করতে স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় ।

গবেষণা সম্পর্কে উপরোক্ত সংজ্ঞা গুলির বিশ্লেষন করলে এটা বলা যায়, গবেষণা গবেষকের মৌলিকতার স্বাক্ষর বহন করে । জ্ঞানানুসন্ধানের মাধ্যমে সত্য আবিষ্কার করাই যে কোনো গবেষণার লক্ষ্য । তাই অনেকে মনে করেন যে, যা সকলের কাছে অজানা তা জানার নাম গবেষণা নয় । বরং যে বিষয়ে সকলের কমবেশি জ্ঞান রয়েছে সেই বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভের পদ্ধতি হল গবেষণা । অবশেষেগবেষণারঅর্থসম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনার সঙ্গে একমত হয়ে বলতে পারি আমরা "জানার মাঝে অজানার সন্ধান করছি" ।

কেন গবেষণা?

1. কিছু সৃজনশীল কাজের মধ্য দিয়ে জ্ঞান লব্ধ আনন্দ পাওয়ার ইচ্ছা,
2. সমাজের সেবা করার ইচ্ছা,
3. প্রায়গিকভাবে কোন সমস্যার সমাধান খোঁজার ইচ্ছা,
4. একটি গবেষণার ডিগ্রী অর্জন এবং ফলাফলসরূপ লাভের ইচ্ছা,
5. শ্রদ্ধাভাজন হওয়ার ইচ্ছা,

6. পুরাতনকে খোঁজা এবং নতুনকে সনাক্ত করা,
7. জনমত তৈরীর জন্য শিক্ষামূলক কার্যক্রম,
8. বিদ্যমান কোন বিষয়ের সত্যতা যাচাই করা

গবেষণার উদ্দেশ্য :-

গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হল, উপস্থিতবিষয়েএমন গোপন সত্য আবিষ্কার করা যা এখনও পর্যন্ত সেই সত্য উন্মোচিত হয় নাই । এছাড়াও গবেষণা আরও কিছু উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে । যেমন-

a) কোন ঘটনা সম্পর্কে পরিচিত হওয়া এবং সেই ব্যাপারে অর্ন্তদৃষ্টি প্রদান । এইধরনের গবেষণা হলঅনুসন্ধামুখীগবেষণা ।

b) কোনো স্বতন্ত্র স্বত্ত্বা, অবস্থা, দল বা গোষ্ঠির সর্বিক চিত্রতুলে ধরা এই ধরনের গবেষণা হল বর্ননা মূলক গবেষণা ।

c) কোনো ঘটনা কতবার ঘটেছে এবং সেইঘটনারসাথেগবেষণাটি কতটুকু সম্পর্কযুক্ত ।

d) চল বা পরিবর্তন গুলির কার্যকারন সম্পর্কে অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাই ।

e) নতুন বিষয় চিন্তা বা গবেষণা করা যা নিয়ে ইতিপূর্বে কিছুই হয় নাই । সেই চিন্তা ধারনাকে উপযুক্ত প্রমানের সাহায্যে সকলের সামনে তুলে ধরা ।

f)গবেষক দ্বারা আবিষ্কৃত গবেষণার নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে রচনা করা, এর গুরুত্ব ও উপকারিতা বর্ননা করা ।

বৈশিষ্ট্য (Characteristics) :-

একটি ভালো গবেষণার কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকে । যেহেতু গবেষণার মাধ্যমে সত্যকে অনুসন্ধান করা হয়, তাই যাতে প্রকৃত সত্যকে খুঁজে পাওয়া যায় তার জন্য গবেষককে সুশৃংখল পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে হয় । ভালো গবেষণার বৈশিষ্ট্য গুলি হল:-

১) ভালো গবেষণা রীতিবদ্ধ(Good research is systematic):-

একটি ভালো গবেষণা হলনতুনঘটনা উদঘাটনের একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি । এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিককলা-কৌশলপ্রয়োগেরমাধ্যমে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া সম্পন্নকরা হয় । অর্থাৎভালো গবেষনা একটিরীতিবদ্ধঅনুসন্ধান প্রক্রিয়া ।

২) **ভালো গবেষনা যৌক্তিক (Good research is logical):-**

একটি ভালো গবেষণা যৌক্তিকভাবেসংগতিপূর্ন ও অর্থপূর্নহয় । এক্ষেত্রেঅনুসন্ধানপ্রক্রিয়ার যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্ত গঠনকরা হয়এবং এইঅনুসন্ধানগুলিরবাস্তব ঘটনা বা তথ্যেরসাহায্যে যৌক্তিকতা যাচাইকরা হয় । কোনো গবেষণায় ব্যবহৃতধারনা যদি বাস্তব জগতের কোনো তথ্যকে নির্দেশ না করেতাহলে তা মুল্যহীনহবে । তাইভালো গবেষণা যৌক্তিক হয় ।

৩) **ভালো গবেষনা অভিজ্ঞতালব্ধ : (Good research is emperical) :**

অভিজ্ঞতালব্ধপর্যবেক্ষনেরমাধ্যমেপ্রাপ্ততথ্যই একটি ভালো গবেষণায় ব্যবহৃত হয় । এ গবেষনা অতিপ্রাকৃতিক বিষয়ের সাথে সম্পর্ক যুক্ত নয় বা অনুমান নির্ভরও নয় । বাস্তবতা ভিত্তিক ও অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যই ভালো গবেষণার প্রান স্বরূপ । বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন বিষয় ভালো গবেষণার উপজীব্য হতে পারে না ।

৪) **ভালো গবেষণা পুনরাবৃত্তি মূলক (Good research is replicable) :**

ভালো গবেষণার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ঘটনার পুনরাবৃত্তি।অনেকক্ষেত্রেভালোগবেষণারমাধ্যমেযেবিষয়টিবাসিদ্ধান্তটিবেড়িয়েআসেতাপূর্বেরকোনো গবেষণারবিষয়েরবাসিদ্ধান্তেরমতপুনরাবৃত্তিহতে পারে। অর্থাৎ পুনরাবৃত্তিভালো গবেষণার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।(Prof. Md Sohrawardi, PP- 83).

সার্বিকভাবে এখন গবেষণার কতগুলি সাধারন বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যেতে পারে । গবেষণার সাধারন বৈশিষ্ট্যগুলি হল:-

১) গবেষণা হল একটি মৌলিক কাজ ।

২) সাধারনত একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করেই গবেষণা কার্যপরিচালিত হয় ।

৩) কোনো নির্দিষ্ট বিশেষদর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি বা মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে খোলা মনে গবেষণায় অত্মনিয়োগ করতে হয় ।

৪) গবেষণার মান নির্ভর করে গবেষকের কৌতুহলী ওঅনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গির ওপর।

৫) গবেষণার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিষয় সংক্রান্ত প্রতিটি নিদর্শন ও তথ্যকে নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি অনুযায়ী গ্রহনকরতেহয়এবং সেই সকল তথ্যে প্রাসঙ্গীক প্রয়োগের প্রতি গুরুত্ব দিতে হয় ।

৬) কোনো বিষয়ে নতুন কোনো নীতি বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং সেই সিদ্ধান্তের সাধারনীকরনই হল গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য ।

৭) গবেষণা যেহেতু একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, তাই এর মূল ভিত্তি যুক্তি, পরিমাপ বা পরিসংখ্যানগত উপস্থাপনার ওপর প্রভূত নির্ভরশীল ।

৮) গবেষণা হলকারন ও তার ফলাফল অর্থাৎ অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্তের এক সম্মিলিত গঠন পদ্ধতি ।

৯) গবেষণা হল গবেষকের জ্ঞান ও বুদ্ধির সচেতন প্রয়োগ ও প্রকাশ । (ডঃ সুরভি বন্দোপাধ্যায়, PP- 11)

১০) গবেষণা পর্যবেক্ষনযোগ্য অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষালব্ধ সাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর জন্য প্রয়োজন নির্ভুলপর্যবেক্ষন ও বর্ণনা । এর জন্য দরকার দক্ষতা।

১১) গবেষণা একটি সময়-সাপেক্ষ, ব্যায় বহুল এবং শ্রমসাপেক্ষ বিষয় । গবেষণার কাজ তাই ব্যাপক উৎসাহ ও ধৈয্যের সাথে করতে হয় ।

১২) গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয় এবং এক সহজ ধারনা দেওয়া হয় ।

১৩) গবেষণার নক্সা(Design)হবে সুপরিকল্পিত যাতে প্রাপ্ত ফলাফল যতটা সম্ভব নৈর্ব্যক্তিক হয় ।

১৪) গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তত্ত্বের(Theory)মাধ্যমে নতুন কিছু জানার সুযোগ সৃষ্টি হয় ।

১৫) গবেষণা শুধু তথ্যের লিপিবদ্ধকরন নয় । বরং তা হল অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহন(Hypothesis),সংগৃহীত তথ্যের বিন্যাস এবং বিশ্লেষণ করার মত কাজ করার যোগ্যতা থাকা ।

১৬) গবেষণা নতুন জ্ঞানের সন্ধান দেয়, যা ইতিপূর্বে ভাবা হয়নাই ।

গবেষণারলক্ষ্য (Aimsof Research) :

অনুসন্ধিৎসু মন সর্বদাই ব্যাকুল থাকে । জ্ঞানপিপাসু মানুষ চিরকাল জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে ধাবিত । জ্ঞানার্জনের আকাঙ্খা মানব সভ্যতাকে ক্রম অগ্রসরমান করেছে । সেই জ্ঞানের যথার্থতা নির্ধারণকরা গবেষণার মূল উদ্দেশ্য । বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে গবেষককে সকল ভ্রান্তির প্রবনতাকে পরিহার করতে হয় । তাই তাকে কোনো বিষয় সম্পর্কে উপসংহারে উপনিত হওয়ার পুর্বে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গবেষককে স্মরণ রাখতে হয় তার মূল্যবোধ কোন ভাবে যেন গবেষণাকে প্রভাবিত না করে ।গবেষণার উদ্দেশ্য হল বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রয়োগের মধ্য দিয়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর আবিস্কার

করা।গবেষণার মুল লক্ষ্য লুকিয়ে থাকা সত্যকে,যা এখনও আবিস্কৃত হয়নি তা খুঁেজ বের করা।যদিও প্রতিটি গবেষণা অধ্যায়নের কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে,নিম্নে উল্লেখিত ভাগগুলোকে বিস্তারিতভাবে গবেষণার লক্ষ্যগুলিহল :-

1. একটি প্রপঞ্চ সর্ম্পকে পরিচিতি লাভ করা অথবা তার মধ্য দিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা।
2. একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি, অবস্থা ও দলের বৈশিষ্ট্যসমূহের বর্ণনা করা।
3. কোন কিছু ঘটে যাওয়ার মাত্রা অথবা তার সাথে সর্ম্পকিত অন্য কিছুকে নির্ধারণ করা।
4. চলকগুলোর মধ্যে অপরিকল্পিত সর্ম্পকগুলোকে পুর্বানুমান করার জন্য পরীক্ষা করা। (Kothari, pp-2)

৫. পুরাতন তথ্য থেকে জ্ঞানের মাধ্যমেনতুন মাত্রা ও সাধারনীকরনের অনুসন্ধান করা ।

৬. নতুন তথ্যের মাধ্যমে পুরাতন সিদ্ধান্তগুলিকে ঝালিয়ে নেওয়া ।

৭. নতুন ধারনার জন্ম দেওয়া বা জ্ঞানের অনাবিষ্কৃত দিগন্ত উন্মোচন করা ।

৮. বিদ্যমান জ্ঞানের মধ্যে দন্দ্ব সমূহের সমাধান করা ।

৯. যে সমস্যার কোনো সমাধান হয় না তাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহন করা ।

১০. গবেষণার লক্ষ্য নতুন কোন গবেষণা মূলক দৃিষ্টভঙ্গী উদ্ভাবন করা।

১১. গবেষণার লক্ষ্য সৃজনশীলতার পরিচয় প্রদান করা ।

১২. সমস্যা চিহ্নিতকরনের মাধ্যমে সমাজকে সেবা প্রদান করা ।

১৩. মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিকসমাজিক পরিবেশের কল্যান বৃদ্ধিকরণ ।

১৪. বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের মাধ্যমে উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর সকলের কাছে অবহিত করা।

খুব সংক্ষেপে গবেষণায় মূলত ৮ ধরনের লক্ষ্য হতে পারে-

1. আবিস্কার
2. বর্ণনা
3. বোঝাপড়া
4. ব্যাখ্যা
5. অনুমান
6. পরিবর্তন
7. মূল্যায়ন

৪. প্রভাবসমূহ নির্ধারণ

গবেষণারপ্রকৃতি (Nature of Research):-

উদ্দেশ্যগত ভাবে যে কোনো গবেষণাই নতুন জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে উপস্থিত জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে আগ্রহী করে তোলে । এর পিছনে কাজ করে গবেষকের অনুসন্ধিৎসু মন এবংসমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ উদ্ভাবনের প্রত্যশা । কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে গবেষণালব্ধফলকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয় । গবেষণারপ্রকৃতি হল :

১) গবেষণা হয় ধারাবাহিক ও সুশৃংখল ।

২) গবেষককে হতে হয় সাহসী ও নিরপেক্ষ । গবেষণার তথ্যাদি সমাজের প্রচলিত নিয়মের বাইরে যায় তা হলেও তা প্রকাশে সাহস থাকা দরকার ।

৩) গবেষককে সকল ধরনের আবেগ বর্জিতের মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করতে হয় ।

৪) গবেষণা একটি সময়-সাপেক্ষ, ব্যায়-বহুল ও শ্রম-স্বপেক্ষ বিষয় ।

৫) অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নির্দেশকের দ্বারা গবেষককে চালিত হতে হয় । অন্যথায় মূলউদ্দেশ্য ব্যহত হয় ।

৬) গবেষণার উপর গবেষণা করে নতুন নতুনতত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কার হয় ।

গবেষকের মূখ্য উদ্দেশ্য হল অনুসন্ধানের মাধ্যমে মানবিক আচরন এবং সমাজ জীবন সম্পর্কে উপলব্ধি করে সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ বজায়রাখা । আপাত দৃষ্টিতে মানুষের সামাজিক জীবন জটিল এবং ভিন্নধর্মী হলেও অন্তনির্হিত সামঞ্জস্য এবং শৃঙ্খলার ধারনাই সামাজিক গবেষণার সোপান । (Seltz, c jahoda, M. Deutch, M and Cook, -25-30)

গবেষণার তাৎর্পয

১. পরিকল্পনার ক্ষেত্রে গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

২. কোন প্রপঞ্চ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দান করতে পারে।

৩. সমাজ সংস্কারমূলক কাজে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে।

৪. মানুষের মূল্যবোধ, অভিমুখীনতা ও কুসংস্কারকে দূরীভূত করতে প্রয়োজনীয় ঐক্যমতের ভিত্তি সৃষ্টি করতে পারে।

৫. জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করতে পারে।

৬. প্রযুক্তির বিকাশ, গ্রহণ ও স্থায়িত্ব প্রদানে সামাজিক সহায়তার ভিত্তি প্রস্তুত করতে পারে।

৭. বিজ্ঞানের ও বিশ্বাসের সামাজিক প্রভাব, প্রতিপত্তি ও দ্বন্দ্বকে মূল্যায়নের মাধ্যমে বিজ্ঞানের দর্শন ও বিজ্ঞানের সমাজতত্ব বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারে।
৮. প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত সঠিক ও যথেষ্ট ভবিষ্যতবাণী করতে না পারলেও সীমিত ক্ষেত্রে সংস্কৃতি ও পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতবাণী করতে পারে।

গবেষণার প্রকারভেদ (Types of Research):-

প্রেরনাগতদিক থেকে (From motivitional Aspect) সামাজিক গবেষণা (Social Science Research) মূলত: দুইপ্রকার- ১) তাত্ত্বিকগবেষণা (Pure Research)এবং ২) প্রয়োগমূলকগবেষণা (Applied Research) ।

১) তাত্ত্বিকগবেষণা বামৌলিক গবেষণা: (Pure Research) :-

যে গবেষণার দ্বারা কোন তত্ত্বের ও পূর্বানুমানের উন্নয়ন ও পরীক্ষা করা হয় অনুসন্ধানকারীর জ্ঞানের স্থান পূরণের উদ্দেশ্যে এবং যার কিনা ভবিষ্যতে সামাজিক প্রায়োগিক দিক থাকবে, কিন্তু বর্তমানের সমস্যা সমাধানের কোন প্রায়গিক দিক নেই তাই মৌলিক গবেষণা। এক কথায় বললে যে গবেষণার দ্বারা জ্ঞানের সংগ্রহ হয় জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তাই মৌলিক গবেষণা। (Kothari 2004:3জ্ঞানের জন্য জ্ঞানান্বেষণ হল শুদ্ধ বা তাত্বিক গবেষণা (gathering knowledege for knowledge's sake)। এক্ষেত্রে বৌদ্ধিক এবং যুক্তি সঙ্গত প্রক্রিয়ার (intellectual and rational process) সমাজ বা মানবিক আচরন সম্পর্কে মৌলধারনা, নীতি এবং তত্ত্ব নির্দেশ করা হয়ে থাকে । এটি কি করা কর্তব্য তা নিয়ে ভাবে না, যা অবস্থান করে তা নিয়েই সংশ্লিষ্ট থাকে ।বস্তুত মৌলিক গবেষণা নিম্নে বর্ণিত দুটি কাজ সম্পন্ন করে।

১. নতুন তত্ব আবিষ্কার

২. বিদ্যমান তত্ত্বের উন্নয়ন

২) প্রয়োগমূলকগবেষণা বা ফলিত গবেষণা**(Applied Research)**:

ফলিত গবেষণা হচ্ছে সেই গবেষণা যার দ্বারা সামাজিক সমস্যা সমাধান সম্ভব, যে সমস্যাগুলো সমসাময়িক উদ্বিগ্নের বিষয়। অর্থাৎ ফলিত গবেষণার লক্ষ্যই হচ্ছে সেই সকল সমস্যা সমাধান পাওয়া যা কিনা কোন সমাজ বা প্রতিষ্ঠানে ঘটছে। (Kothari 2004:3) তাত্বিক গবেষণা ও ফলিত গবেষনা পরস্পর সম্পর্কিত, কারণ তাত্বিক গবেষণা ফলিত গবেষণার পথপ্রদর্শক। মানব সমাজের অবস্থার উন্নয়নের জন্য সহায়ক জ্ঞান অর্জনকে প্রয়োগ মূলক গবেষণা বলে (Gathering knowledege that could aid in the betterment of human destiny is termed as applied or practical research) । এই গবেষণা মানব সমাজের আশু সমস্যাবলীর সমাধানের পথ নির্দেশ করে থাকে । কি হওয়া উচিত তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে । এই গবেষণা মূল্যমান সাপেক্ষ এবং উপযোগিতা নির্ভর ।

উদ্দেশ্য গতভাবে সামাজিক গবেষণা তিন প্রকার- ১) অনুসন্ধানমূলক গবেষণা (Exploratory Research), ২) বর্ননামুলক গবেষণা (Descriptive Research) ৩) ব্যাখ্যামূলক গবেষণা (Explanatory Research) ।

১) অনুসন্ধানমূলক গবেষণা (Exploratory Research) :

এইগবেষণায়–

(a)কোনো নতুন বিষয় বা স্বল্পচর্চিত বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য প্রথম অনুসন্ধান করা হয়

(b) গবেষকের উদ্দেশ্য হবে যথার্থ গবেষনামূলক প্রশ্ন নির্ধারন করা । এই ধরনের গবেষণা-

(i) অপেক্ষাকৃত বেশি নিবিষ্ট অনুশীলন,

(ii) উৎসুক্য ও আকাঙ্খার দ্বারা প্রভাবিত।

২) বর্ণনামুলকগবেষণা (Descreptive Research) :

এইগবেষণায়–

(a) কোনো এক সামাজিক অবস্থার বা সম্পর্কের বিশেষ ও বিষদ বিবরণমূলক চিত্র তুলে ধরা হয়।

(b) এই ধরনের গবেষণা কী, কে, কেমন মূলক (what, who, how centric),

(c) তথ্য সংগ্রহের জন্য বহুপদ্ধতির ব্যবহার হয়ে থাকে, যেমন- পরীক্ষা, ক্ষেত্রসমীক্ষা, অভ্যন্তরীন বিষয় বিশ্লেষন, তুলনামুলক পদ্ধতি ইত্যাদি ।

৩)ব্যাখ্যামূলক গবেষণা (Explanatory Research) :

এইগবেষণায়-

(a)কোনো সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানলাভের পর ঐ অবস্থার কেন (why) সম্পর্কিত প্রশ্ন উঠে আসে এবং

(b) এই কেন (why)-এর ব্যাখ্যাই ব্যাখ্যামূলক গবেষণা ।

সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণাকে কালমাত্রার (Time Dimention) দিক থেকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় - ১) গবেষণা একক সমুহের আড়াআড়ি এক অংশের গবেষণা (Cross section study) এবং ২) গবেষণার একক সমূহের কোনো অংশের সময়ান্তরে গবেষণা (Longitudinal study) ।

১)গবেষণা একক সমুহের আড়াআড়ি এক অংশের গবেষণা (Cross section study):

কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর/ক্ষেত্রের বিভিন্ন শিক্ষাগত মান, আয়, ধর্মানুসরন, নৃ-গোষ্ঠীগত বিন্যাস ইত্যাদি সমন্বিত জনগোষ্ঠীর এক নমুনা অংশকে বোঝায় । এই গবেষনায় গবেষক আড়াআড়ি এক অংশকে এককালীন অবস্থায় পর্যবেক্ষন করে থাকেন।

২)গবেষণার একক সমূহের কোনো অংশের সময়ান্তরে গবেষণা (Longitudinal study): গবেষণায় একক সমূহকে গবেষক একাধিক সময়ে পর্যবেক্ষন করে থাকেন । পর্যবেক্ষন গুলি একাধিক, সপ্তাহ, মাস, বছর কালে হতে পারে । এই গবেষণা সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল ।

গবেষণার অন্যান্য শ্রেণী বিভাগ:

উপরে আলোচিত গবেষণার প্রকারভেদ ছাড়াও গবেষণাকে আরও শ্রেণীবিভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন:

- বর্ণনামূলক গবেষণা বনাম বিশ্লেষণমূলক গবেষণা (Descriptive vs. Analytical research)

- গুণগত গবেষণা বনাম পরিমাণগত গবেষণা (Qualitative vs. Quantitative research)
- ধারণাভিত্তিক গবেষণা বনাম সরেজমিনে গবেষণা (Conceptual vs. empirical research)

বর্ণনামূলক গবেষণা বনাম বিশ্লেষণমূলক গবেষণা(Descriptive vs. Analytical Research):

বর্ণনামূলক গবেষণার দ্বারা বিভিন্ন জরিপ এবং অনুসন্ধান চালানো হয় বিভিন্ন ঝটনা উৎঘাটনের জন্য। এই গবেষণার লক্ষ্য হল বর্তমানে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে বর্ণনা করা। আর এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এই গবেষণায় গবেষকের চলকের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, কেবলমাত্র বর্ণিত হয় যা ঘটেছে বা ঘটে চলছে। অন্যদিকে বিশ্লেষণমূলক গবেষণা হচ্ছে যেখানে আগেই ঘটনা উপস্থাপিত থাকে, আর এই গবেষণার দ্বারা সেই ঘটনার সূক্ষ্ম মূল্যায়ন ঘটে।

গুণগত গবেষণা বনাম পরিমাণগত গবেষণা(Qualitative vs. Quantitative Research):

গুণগত গবেষণা হচ্ছে যেখানে কোন কিছুর গুণকে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে পরিমাণগত গবেষণার ভিত্তি হচ্ছে সংখ্যাবাচক পর্যালোচনা। অর্থাৎ সংখ্যাবাচক পর্যালোচনার মাধ্যমে কোন ঘটনা বা বিষয়কে ব্যাখ্যা করা। যা কিনা গুণগত গবেষণায় গুণকে পর্যালোচনা করা হয়।

ধারণাভিত্তিক গবেষণা বনাম সরেজমিনে গবেষণা(Conceptual vs. Empirical Research):

ধারণাগত গত গবেষণার সাথে ভাবনা এবং তত্ব সম্পর্কিত। এই গবেষণা সাধারণত দার্শনিক এবং চিন্তাবীদরা করে থাকেন, যার মাধ্যমে তাঁরা নতুন কোন তত্ব বা বিদ্যমান কোন বিষয়কে ব্যাখ্যা করে থাকেন। অন্যদিকে সরেজমিনে গবেষণা হচ্ছে পুরোটাই অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে, কখনো কোন পদ্ধতি কিংবা তত্বের উপর নির্ভরশীলতা ছাড়াই। ইহা তথ্য নির্ভর গবেষণা। (Kothari 2004:3-4)

সামাজিক গবেষণায় বিভিন্নপর্যায় (Different Stages of Social Science Research) :

সামাজিক গবেষণায় গবেষণা কার্যটি নিম্নলিখিত পর্যায়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে-

১) গবেষণার বিষয়নির্বাচনবাগবেষণা সমস্যার সংজ্ঞায়ন (Selecting a Research Topic) :সাধারণত গবেষণার সমস্যা হচ্ছে কোন গবেষক তাত্বিক কিংবা বাস্তবিক অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে জটিলতায় পড়লে যা সমাধান বা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। আর গবেষণার প্রথম ধাপই হচ্ছে গবেষণার জন্য সমস্যা নির্ধারণ এবং গবেষণার সমস্যাকে পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করা। আর এই সমস্যা কখনো গবেষকের আগ্রহ থেকে আসে আবার কখনো তত্বের উপরও নির্ভর করে। আর সমস্যার উপর নির্ভর করে গবেষণার ক্ষেত্র নির্বাচন করেন একজন গবেষক।

২) প্রসাঙ্গীক মুদ্রিতরচনা / সাহিত্য পর্যালোচনা (Literalure Review):
গবেষণার বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যেই মূলত গবেষণায় সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়, কিন্তু তার থেকেও বেশি গুর"ত্বপূর্ণ একটি কার্যকরী গবেষণা পদ্ধতি গ্রহণ করা। আর সেক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সংবাদপত্র, সম্মেলনের আলাপ-আলোচনা, সরকারি প্রতিবেদন, বই, ইন্টারনেট ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। সাধারণত দুই ধরণের সাহিত্য পর্যালোচনা করা যায়, যেমন: তত্ব ও ধারণা লব্ধ সাহিত্য এবং পূর্ব অভিজ্ঞতালব্ধ অধ্যয়নের সাহিত্যসমূহ।

৩) গবেষণা সমস্যা ও প্রকল্প নির্মাণ (Formulation of Research Problem and Hyothesis):গবেষণার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যামূলক হলে (Exploralory) গবেষণা মূলক প্রশ্নের পরীক্ষা মূলক উত্তর নির্ধারন করা হয়ে থাকে । এই পরীক্ষা মূলক উত্তরকে প্রকল্প (hypothesis) বলে । প্রকল্প আরোহী (Inductive) অথবা অবরোহী (Deductive) পদ্ধতিতে গঠিত হয়ে থাকে ।

(a)আরোহী (Inductive): এটি হল কতোগুলো সরল সত্যের মাধ্যমে একটি সাধারণ সত্য বা চূড়ান্ত সত্যে উপনীত হওয়া।এটি তথ্য নির্ভর ।
যেমন-
ভগত সিং একজন দেশ প্রেমিক স্বাধীনতা সংগ্রামী।
আসফ আলী একজন দেশ প্রেমিক স্বাধীনতা সংগ্রামী।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস একজন দেশ প্রেমিক স্বাধীনতা সংগ্রামী।

সুতরাং সব স্বাধীনতা সংগ্রামীই দেশ প্রেমিক।

(b)অবরোহী (Deductive): একটি চূড়ান্ত সত্যের মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত/ প্রমানিত একটি সত্য থেকে কতোগুলো সরল সত্যে উপনিত হওয়ার পদ্ধতি হচ্ছে অবরোহ।এটি অনুমান ভিত্তিক এবং তত্ত্ব নির্ভর ।

যেমন–

মানুষ মরণশীল।

তিমির মণ্ডল একজন মানুষ।

সুতরাং তিমির মণ্ডল মরণশীল।

৪) গবেষণার নক্সা প্রস্তুতকরন (Making a Research Design) :

প্রাসঙ্গিক তথ্যের ভিত্তিতে পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার নক্সা নির্ধারন করা হয় । তথ্য বিভিন্ন ভাবে সংগৃহীত হয় ।

a) প্রাথমিক উৎস (Primary Source) : নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত ও আবিষ্কৃত তথ্য প্রাথমিক উৎসরূপে বিবেচিত হয় ।

b) সহায়ক বা গৌন উৎস (Secondary Source) : প্রাথমিক উৎস থেকে বিশ্লেষিত তথ্যই গৌন উৎস বলে বিবেচিত হয় ।

৫) তথ্যসংগ্রহ (Data collection) :তথ্য হল যে কোনো সামজিক গবেষনার ভিত্তিস্বরূপ। পর্যবেক্ষনের ফলই হল তথ্য । তথ্য সাধারনত দুই প্রকার-

১) প্রাথমিক তথ্য বা প্রত্যক্ষতথ্য (Primary Source/ Primary Data): যা গবেষকের নিজ লিপিবদ্ধ তথ্য । প্রাথমিক তথ্যের মধ্যে পড়বে ইন্টারভিউ, সরকারি গেজেট, সরকারি রিপোর্ট ইত্যাদি । এই তথ্য গবেষক সরাসরি মানুষ/সরকার/প্রতিষ্টান থেকে পেয়ে থাকেন ।

২) পরোক্ষ বা মাধ্যমিক তথ্য (Secondary Source/data) যা গবেষকের জন্য অন্যের দ্বারা বা অন্য সূত্রে প্রাপ্ত লিপিবদ্ধ তথ্য । পরোক্ষ তথ্যের মধ্যে পড়বে বই, জার্নাল, খবরের কাগজ, দৈনিক ইত্যাদি । এই তথ্য গবেষক নথি সূত্রে সংগ্রহ করে থাকেন । এই নথি আবার দুই প্রকার । (a)

প্রত্যক্ষ বিবরন নির্ভর নথি (Direct boservation document), যা রেকর্ডবলে চিহ্নিত হয়ে থাকে । (b) পরোক্ষ বিবরন নির্ভর নথি (Direct boservation document), যা Reportsবলে চিহ্নিত হয়ে থাকে । (Bailey; J.L. Introduction to the Methods of Social Science, Edit by J.C Johari, Sterling Publishers Pvt New Delhi, 1988 pp. 87) ।

Ex.

a) Primary data: Example :Case Study, Unit Survey, Obserbation Method, Interview Method,

b) Secondary Data: i) Books, (ii) Jarnals, Magazine, Newspaper, (iii) Report by Govt or NGO, (iv) Reports by Research Scholoars (v) Public Records, Statics Historical Document and others sources of publication.)

6) তথ্য বিশ্লেষণ(Data Analysis):

তথ্যগুলিতে কতকগুলি পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়ে থাকে । Raw data বা অবিন্যস্ত তথ্যগুলিকে কতগুলি বর্গে (Categoris) শ্রেণী বিভক্ত (Classified) করা হয় । পরিসংখ্যন পদ্ধতি প্রয়োগ করে তথ্যগুলি বিশ্লেষন করা হয় । পরিসংখ্যন পদ্ধতি প্রয়োগ করে অনুপাত, সমানুপাত, শতাংশহারইত্যাদি নির্ণয়ের দ্বারা তুলনামূলক বিশ্লেষন করা হয় **(Ahuja, 273)**। তথ্য বিশ্লেষনেযে পদ্ধিতিগুলি লক্ষ্য রাখতে হয় সেগুলি হল–

* রেখাচিত্রের দ্বারা তথগুলির প্রকৃতি প্রদর্শন করা হয় ।

* কেন্দ্রীয় প্রবনতা (Central tendency) ও বিস্তৃতি (dispersion) নির্ণয় দ্বারা তথ্যের সংক্ষেপায়ন এবং সহগমন সহগাঙ্ক নির্নয়ের মাধ্যমে এক ঘটনার সাথে আর এক ঘটনার বা একটি চলের(Variable) সাথে অন্য চলের(Variable) সম্পর্ক নির্নয় করা হয়।

* যেহেতু গবেষণার উদ্দেশ্য সাধারন সিদ্ধান্তকরনের (Genesalization) অথবা আরোহী পরিসংখ্যন পদ্ধতির দ্বারা সামামীকরনের চেষ্টা । তাই এক্ষেত্রে Chi- Square, t-test, Z-test ইত্যাদি পদ্ধতি প্রয়োগকরা হয়ে থাকে ।

* অনেক সময় গবেষণার শুরুতে প্রকল্প না নেওয়া হলেও তথ্য বিশ্লষনের মাধ্যমে কোনো প্রকল্পের নির্দেশ করা যেতে পারে যা পরবর্তী কোনো গবেষনায় পরীক্ষিত হতে পারে ।

তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার বিষয়টি কোন গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে এবং গবেষণার উদ্দেশ্য কি তার উপর নির্ভর করে। এখানে সময় ও কতটুকু পরিশ্রম

করতে হবে তাও এর উপর নির্ভর করে। তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার জন্য হয়তো অনেক দিন বা কয়েক মাস লাগতে পারে । আবার অনেক বেসরকারি গবেষণায় একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তরের জন্য গবেষণা করা হয়। এখানে তথ্য বিশ্লেষণ বিষয়টি কয়েক মিনিটে হয়ে যায়।

প্রতিটি গবেষণা পরিকল্পিত ও যত্নসহকারে করতে হবে। ব্যাখ্যার শেষে গবেষকরা পেছনে এসে খুজে বের করবেন যে এ গবেষণা থেকে কি পাওয়া গেল। গবেষককে দুইটি প্রশ্নের উত্তর খুজে বের করতে হবে।

১.ফলাফলটিবাস্তবকিনাএবং
২। ফলাফল টি সঠিক কিনা।

এরসঙ্গেখুঁজে বের করতে হবে আভ্যন্তরীণ বৈধতা (Internal Validity) ও বাহ্যিক বৈধ্যতা (External Validity)।

১. আভ্যন্তরীণ বৈধতা (Internal Validity)

একটি বিশ্বাস যোগ্য গবেষণা তৈরি করতে গবেষকদের গবেষণা অবস্থানের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা জরুরি। উদাহরণ – গবেষকগণ প্রমাণ করতে চান যে , x হল y এর ফাংশন। বা $y = f(x)$. গবেষণার শর্তগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য এখানে খুঁজে বের করতে হবে যে, $y=f(b)$ যে খানে b একটি বাহ্যিক চলক। এখানে এরকম চলক যা সম্ভব , কিন্তু ভুল ব্যাখ্যা প্রমাণ করে তাকে **Artifact** বলে। এর উপস্থিতি অভাব **Internal Validity** র নির্দেশ করে।

Artifact গবেষণায় বিভিন্ন উৎস্ থেকে তৈরি হতে পারে। নিচে এর কিছু উৎস্ দেওয়া হল :

1.History
2. Maturation
3.Testing
4.Instruments
5.Statistical Regression

6.Experimental Morality
7. Sample Selection
8. Demand Characteristics

২. বাহ্যিক বৈধ্যতা (External Validity)

এটি দ্বারা বোঝানো হয়, কিভাবে একটি গবেষণার ফলাফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌছানো যায়। **External Validity** গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন চলক যেমন – বিষয় নির্বাচন, যন্ত্রপাতি, পর্যবেক্ষণের শর্ত প্রভৃতি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত। এটির অভাবে অন্যান্য পরিস্থিতি তে ... ব্যবহার করা যায় না। শুধু নমুনায়নের পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা যায়।

7) গবেষণাপ্রতিবেদন(Report Writing):

এখানে গবেষণা প্রতিবেদনকে মূলত: তিনটি পর্বে ভাগ করা হয় - (a) প্রারম্ভিক (Primary) (b) প্রধান (Main) এবং (c) অন্তভাগ (End matter)

(a) (a) প্রারম্ভিক (Primary) :- এখানে থাকবে Title/ শিরোনাম, acknowledgement/ প্রাপ্তি স্বীকার/ সূত্র- স্বীকৃত এবং Perface/ মুখবন্ধ । এছাড়াও বিষয়সূচি, সরনী, লেখচিত্র ইত্যাদি ।

(b) (b) প্রধান (Main) :-প্রধান অংশে মূল বিষয়ের সহজ ভাষায় বিবরণ ।

(c) অন্তভাগ (End matter) : পরিশিষ্ট, গ্রন্থপঞ্জী, অনুক্রমনী (index) ইত্যাদি ।

গবেষণার পর্যায়টি একটি ছকের সাহায্যে দেখানো হল :

গবেষণায় বিষয় নির্বাচন (Selecting a Research Topic)

সাহিত্য পর্যালোচনা (Literatne Review)

গবেষণায় সমস্যা বা প্রকল্প নির্বাচন (Formulation ofResearch or Hypothsis)

গবেষণার নক্সা প্রস্তুতকরন (Making a Research design)

তথ্যসংগ্রহ(Data Collection)

তথ্য বিশ্লেষন (Data Analysis)

প্রতিবেদন রচনা (Repart Writing)

গবেষনার তাত্ত্বিক ভিত্তি:

গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো হল এখন ভিত্তি যার মধ্য দিয়ে সমস্ত জ্ঞান গবেষণার জন্য সংগঠিত হয়। এটি একটি গবেষণার বৈজ্ঞানিক কাঠামো ও যৌক্তিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। দৃষ্টবাদ (Positivism)হল গবেষণার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঠিক ব্যবহার ।

দৃষ্টবাদ(Positivism):

দৃষ্টবাদ বা ইতিবাচকতাবাদ (Positivism)সাধারন দৃষ্টিভঙ্গির দিকে জোড় দেয় । যা অভিজ্ঞতা স্বাপেক্ষ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন কোনো কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস না করাইহল প্রত্যক্ষবাদ বা দৃষ্টবাদ বা ইতিবাচকবাদ বা পজিটিভিজম । অগাষ্ট কোঁতের মতে, জ্ঞানের তিনটি স্তরের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয় দৃষ্টবাদী তত্ত্ব । প্রথমে, যে কোনো ধরনের জ্ঞান ধর্মতত্ত্বীয় আকারে শুরু হয় । **প্রথমে** জ্ঞানেকে ব্যাখ্যা করা হবে যে কোনো ধরনের উচ্চতর অতিপ্রকৃত ক্ষমতার দ্বারা । উদাহরন হিসাবে বলা যায় সর্বপ্রানবাদ, আত্মা বা দেবতা ইত্যাদি দ্বারা । **দ্বিতীয় স্তরে**জ্ঞানবিমূর্তদার্শনিকভাবনাচিন্তাদ্বারাব্যাখ্যাকরাহয়।সামাজিকগবেষণায়প্রকল্পকেবাস্তবায়িতক রাররূপরেখাতৈরিকরাহয়উপাত্তসংগ্রহ (Data Collection) –রমধ্যদিয়ে।**তৃতীয় স্তরে**

পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং তুলনার বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা দ্বারা জ্ঞান ইতিবাচক হবে । সামাজিক গবেষনায় সংগৃহীত তথ্যগুলি বৈজ্ঞনিক ভিত্তিতে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হতে হবে । দৃষ্টবাদ সামাজিক গবেষণায় একটি কার্যকারী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ।

দৃষ্টবাদ হল সমাজ বিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঠিক ব্যবহার । দৃষ্টিবাদী ধারনা অনুযায়ী, একমাত্র পর্যবেক্ষন যোগ্য ঘটনা এবং তার যুক্তি ভিত্তিক বিশ্লেষন সমাজ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক বিষয়বস্তু হওয়া উচিত । দৃষ্টবাদ বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির রহস্যকে উন্মোচনের চেষ্টা করে । অর্থাৎ প্রকৃতিকে পাটকরার জন্য সমাজি বজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগই হল দৃষ্টবাদ ।

দৃষ্টবাদেররূপ:- দৃষ্টবাদের মূলত তিনটি উপদান আছে, এগুলি হল ১) পদ্ধতি হিসাবে দৃষ্টবাদ ২) বিজ্ঞানের ক্রমোচ্চ বিন্যাস ও দৃষ্টবাদের ভিত্তিতে গড়ে উঠা সমাজব্যবস্থা এবং ৩) ভাবাদর্শ হিসাবে দৃষ্টবাদ ।

১) পদ্ধতি হিসাবে দৃষ্টবাদ:

দৃষ্টবাদের মর্মবানী হল" বিজ্ঞানের একত্ম"(Unity of Science)" এর অর্থ প্রকৃতি ও সামাজিক বিজ্ঞানের একই যৌক্তিক এবং পদ্ধতিগত ভিত্তি রয়েছে । সমাজ বিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন পরাদর্শন / অনুমান নির্ভর ভাবনা থেকে মুক্ত হওয়া । অগাষ্ট কোঁত এর মতে, দৃষ্টবাদী সমাজ বিজ্ঞানের কাজ হল ঘটনার অনুসন্ধান এবং তার ভিত্তি নিশ্চিত নিয়মকে আবিষ্কার করা প্রাকৃতিক নিয়ম সবক্ষেত্রেই একই রকম এর কোনো তারতম্য নেই এবং সমাজে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ইচ্ছার কোনো মূল্য নেই । সমাজ প্রকৃতির মতোই যুক্তিভিত্তিক নিয়মে পরিচালিত হয় ।
সমাজ বিজ্ঞানের কাজ একই নিয়মের ভিত্তিতে তত্ত্ব নির্মান করা । দৃষ্টবাদী পদ্ধতি সমাজ বিজ্ঞানী এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একই ভূমিকা পালন করে । এর ভিত্তি হল ঘটনার পযবেক্ষন, পরীক্ষন এবং তুলনা ।

২) বিজ্ঞানের ক্রমোচ্চ বিন্যাস ও দৃষ্টবাদী সমাজ :

অগাষ্ট কোঁতের মতে, বিজ্ঞানের বিবর্তনের একটি সাধারন নিয়ম আছে যা অগ্রসর হয় । সহজ থেকে জটিলের দিকে, বিজ্ঞানের শুরু গনিত থেকে এবং তার বির্বতন জ্যোর্তিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা রসায়নশাস্ত্র, জীববিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে সমাজ বিজ্ঞানে প্রতিটি পরবর্তী বিজ্ঞান অধিকতর নির্দিষ্ট, কিন্তু কম যথাযথ, কেননা পরবর্তী বিজ্ঞান গুলির বিষয়বস্তু জটিলতর এবং কম পরিমাপ যোগ্য ।

মানব সমাজও একই ভাবে তিনটি স্তরের ভিতর দিয়ে বিকাশ লাভ করে যথা i) ধর্মতাত্ত্বিক ii)পরাদর্শন ভিত্তিক এবং iii) দৃষ্টবাদী, সমাজ বির্বতনের সাথে যুক্ত মানুষের যৌত্বিক, বস্তুগত এবং নৈতিক উন্নতি গঠিত হয় ধর্মতাত্ত্বিক স্তরে মানুষ বিশ্বের মধ্যে সাধারন এবং বিমূর্ত্ত সারবত্তার ধারনার সৃষ্টি করতে পারে, দৃষ্টবাদী স্তরে মানুষকে বৈজ্ঞানিক স্তরে অবলোপন করতে পারে । এভাবে বিজ্ঞানের নিয়ম ও সমাজের নিয়ম একীভূত হয়ে যায় ।

৩) ভাবাদর্শ হিসাবেদৃষ্টবাদ :

দৃষ্টবাদ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে যথার্থ মনে করে এবং তাকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্যে করে । সমস্ত সমাজ বিকাশমান, এবং জ্ঞানের সাহায্যেতার ক্রম উৎকর্ষ সাধন সম্ভব । তাই দৃষ্টবাদ মনে করেন সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই । দৃষ্টবাকে সঠিক ভাবে প্রয়োগ করে সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখা সম্ভব ।

উত্তর–দৃষ্টবাদ :

উত্তর দৃষ্টবাদ হল সমাজ বিজ্ঞানে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির গোঁড়ারির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা । তবে দৃষ্টবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে উত্তর দৃষ্টবাদ অবৈজ্ঞানিক হয়ে যায় নি । মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে সামনে রেখে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঠিক ব্যবহারের কথা বলে উত্তর-দৃষ্টবাদ । উত্তর-দৃষ্টবাদ সামাজিক গবেষণায় গবেষককে আর্দশ, নীতি-নৈতিকতায় আবদ্ধ হতে সাহায্যে করে । অর্থাৎ উত্তর দৃষ্টবাদ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আদর্শ, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত না হয়ে যা সময়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গীক তার কথা বলে । বলা যায় উত্তর-দৃষ্টবাদ দৃষ্টবাদের সামগ্রীকবিরোধীতা না করে তার গঠনগত সমালোচনা করে মূল্যবোধ কে সামনে রেখে গবেষণায় বিজ্ঞান সম্মত পর্যালোচনা করে । দৃষ্টবাদ বিজ্ঞান সম্মত পর্যালোচনার উপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে গবেষণা পদ্ধতির পরিমানগত বা সংখ্যাত্মক পদ্ধতির উপর গুরুত্ব

দেয় এবং উত্তর-দৃষ্টবাদ পরিসংখ্যাত্মক বা সংখ্যাত্মক পদ্ধতির সাথে সাথে বিশ্লেষাত্মক বা গুনাত্মক পদ্ধতির উপরও গুরুত্ব দেয় ।

উত্তর-দৃষ্টবাদ দৃষ্টবাদের সমালোচনা হিসাবে উপস্থিত হয় কার্ল পপারের Logic of Scientific Discovery (1959)গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে । এছাড়া দৃষ্টবাদের জোড়ালো প্রতিবাদ হিসাবে উপস্থিত হয় টমাসকুন এর The Structure of Science Renolution (1962), Karl PaparerConjections of Refucations (1963), আয়ান হ্যাকিং এর Representing and Intervening (1983),ন্যান্সি কার্টরাই এর Natures Capacities and Their Measurement (1989), ইত্যাদি গ্রন্থগুলি ।

সামাজিক গবেষণায় গুনাত্মক গবেষণার বিকাশে দৃষ্টবাদের সমালোচনা হিসাবে উত্তর-দৃষ্টবাদের আবির্ভাব হয় । সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়, যেমন- নারীবাদ, উত্তর কাঠামোবাদ, উত্তর দৃষ্টবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । উত্তর-দৃষ্টবাদের ভাবনায় যে তাত্ত্বিক দিক এসে যায়, তা হল-

- জ্ঞান নিরপেক্ষ হতে পারে না ।
- দ্বৈত মনোভাব যথাথনয় । যেমন- সদা/কালো, প্রাচ্য/পাশ্চাত্য চিন্তাভাবনা ছোট-এড়ইত্যাদি ।
- গবেষণা কোনো নীতি-নৈতিকতাহীন বিষয় নয় ।

উত্তর-দৃষ্টবাদের বৈশিষ্ট্য(Characteristies of Post- Positivism) :

সামাজিক গবেষণায় উত্তর-দৃষ্টবাদের কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় :- যথা-

১. গবেষণা কোনো একক নির্দিষ্ট ঘটনা সংক্রান্ত বিষয় থেকে অনেক বড়; বিভিন্ন ধরনের ঘটনার বিষয়গুলি হল গবেষণার বিষয় বস্তু ।

২. তত্ত্ব ও অনুশীলনকে আলাদা করে দেখা যায় না ।

৩. শুধুমাত্র ঘটনাকে গ্রহণ করার জন্য তত্ত্বকে বাদ দেওয়া যায় না ।

৪. গবেষকের উদ্দেশ্য এবং গবেষণার প্রতি প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হল গবেষণার প্রধান এবং অপরিহার্য অংশ ।

৫. গবেষণার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সঠিক তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতি ও তথ্যের শ্রেনী বিন্যাস একমাত্র বিষয় নয় ।

৬. শুধুমাত্র সংখ্যাত্মক বিষয়ের উপর নয়, বিশ্লেষনাত্মক বা গুনাত্মক বিষয়ের উপরও গুরুত্ব দেয় ।

৭. গবেষক সামাজিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিষয়গুলির প্রতিদায়বদ্ধ ।

৮. শুধুমাত্র তথ্যনয়, পরিবর্তীত পরিস্থিতিতে প্রাসঙ্গীক বিষয়গুলি সমানভাবে কার্যকারী (Action) হবে ।

পরিশেষে বলা যায় দৃষ্টবাদের গঠনমুলক সমালোচনা করে উত্তর-দৃষ্টবাদ ও সামাজিক গবেষণায় সংখ্যাত্মক বিষয়ের সাথে সাথে বিশ্লেষণাত্মক বা গুনাত্মক গবেষণা পদ্ধতির উপর গুরত্ব আরোপ করে । অবশ্য এটি করতে গিয়ে উত্তর-দৃষ্টবাদ গবেষণা পদ্ধতির তাত্ত্বিক কাঠামো নির্ম্মান তৈরী করে নি । উত্তর-দৃষ্টবাদ সামাজিক গবেষণায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি মূল্যবোধযুক্ত বিষয়গুলিকে প্রাসঙ্গীক মনে করেছে ।

তথ্যসুত্রঃ

1. Prof. Md Sohrawardi: Research Methodology, Metro Publication, Dhaka,2017, PP- 831.

2. L.V Redman and AVH Mory : The Romance of Research, 1923, P- 10

3. Prof. Md Sohrawardi: Research Methodology, Metro Publication, Dhaka,2017, PP- 83

4.C.R. Kothari: Research Methodology: Methods And Techniques, New Age Publishers, Delhi, 2004

5. Seltz, C Jahoda, M. Deutch, M and Cook, S: Research Method in Social Natations, Methuin Co. Ltd, 1965, P. 25-30

6. Bailey; J.L. Introduction to the Methods of Social Science, Edit by J.C Johari, Sterling Publishers Pvt New Delhi, 1988, pp-87

7. Ram Ahuja: Research Methods, Rawat Publications, Delhi, 2001

৪. ডঃ সুরভিবন্দোপাধ্যায়, গবেষনা: প্রকরন ও পদ্ধতি, দেজপাবলিশিং, কোলকাতা, ১৯৯০, PP- 11